কাজলের চৌষট্টি কলা

স ব্য সা চী স র কা র

পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে— কবি যাই বলুন, আঁখির কোণে থাকা চিরপুরাতন কাজল নিয়ে আজ কিছু লেখার মানেই হয় না। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন উষ্ণ পৃথিবীতে কয়লা নিয়েই বা কী সাতকাহন বলার আছে! কিন্তু, বিশ্বাস করুন, মাঝে মাঝে যে চিরপুরাতনকে টানতেই হয়, কারণ কী এক আশ্চর্য যোগাযোগে সে প্রতিদিন চিরনূতন হয়ে উঠতে থাকে, যে দিকে তাকিয়ে এমনকী সাধারণের দৃষ্টিতে আবেগহীন, রসকষহীন, সারাক্ষণ ফরমুলা চিবোতে ব্যস্ত বিজ্ঞানীরাও বিহ্বল হয়ে পড়েন।

গেটি ইমেজেস

অবশ্যই সব কিছু পুরনো হয় না। ডায়মন্ডস আর ফর এভার। রসায়নবিজ্ঞানের জনক ল্যাভয়সিয়ের প্রমাণ করেছিলেন, কয়লা আর হিরে একই মৌল কার্বন-এর দুই রূপ, তাতে অবশ্য হিরের চাহিদায় ভাটা পড়েনি, কয়লাও মহার্ঘ হয়ে ওঠেনি। বৈজ্ঞানিক শিলে এরপর দেখালেন যে, গ্রাফাইটও কয়লার আর একটি রূপ। গ্রাফাইট আবার আমাদের কাঠপেনসিলের শিস হয়ে লেখাপড়ার মজ্জায় প্রবেশ করেছে। এবং সেটাই সব নয়, এই গ্রাফাইট কাজে লাগছে ব্যাটারিতে, মাইক্রোফোনে। চলচ্চিত্র প্রজেকশনে বা ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির গোড়ার যুগে এই গ্রাফাইটই আলো জুগিয়েছিল। হিরের অলংকার-প্রতিভা, কোহিনূর ও হোপের মতো ঐতিহাসিক সম্পদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ একেবারেই তুলছি না, কেবল বলতে চাই সব থেকে শক্ত পদার্থ হওয়ার সুবাদে হিরের প্রায়োগিক ব্যবহারও অজস্র।

কয়লাকে আমরা চিনি জ্বালানি হিসেবে। কিন্তু আকাশের জ্বলন্ত পিণ্ড অর্থাৎ নক্ষত্রগুলি কয়লা পোড়ায় না, বরং তারা কয়লার মূল উপাদান কার্বনের জন্ম দেয়। নক্ষত্রের জ্বালানি হল প্রাথমিকভাবে হাইড্রোজেন। নক্ষত্রগুলো থার্মোনিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ায় সেই হাইড্রোজেন থেকে নিষ্কাশন করে শক্তি, পরিণামে হাইড্রোজেন পরিণত হয় হিলিয়ামে। সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় ওজনের নক্ষত্রগুলোতে হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেলে শক্তি জোগায় হিলিয়াম, নিজে পরিণত হয় কার্বনে। আয়ু ফুরোলে এই নক্ষত্রগুলো মৃত্যুযন্ত্রণায় ফুলে ওঠে। তার ভেতরকার প্রচণ্ড চাপ সমস্ত কার্বনকে রূপান্তরিত করে হিরে আর গ্রাফাইটে, আলো নিস্তেজ হয়ে যায়, নক্ষত্রটি নির্বাসিত হয় শ্বেত বামন বা 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' দশায়। বিভিন্ন নক্ষত্রের বিবর্তনের সময় কিছু বিস্ফোরক পর্বে তাদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসে কার্বনের মেঘ। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও নক্ষত্রশরীরের অন্যান্য নানা গ্যাস সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলি মহাশূন্যে ভেসে বেড়াতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এগুলিকে বলেন ইন্টারস্টেলার ডাস্ট। আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণা।

স্পেকট্রোস্কোপি বা বর্ণালিবীক্ষণের (কোনও পদার্থ

কাজল, হিরে, পেনসিলের শিস। মহাশূন্যে ভেসে থাকা ভুষোকালির জাদুগোলক থেকে আধুনিক ঔষধ— কার্বন এখনও অঘটনঘটন-পটিয়সী।

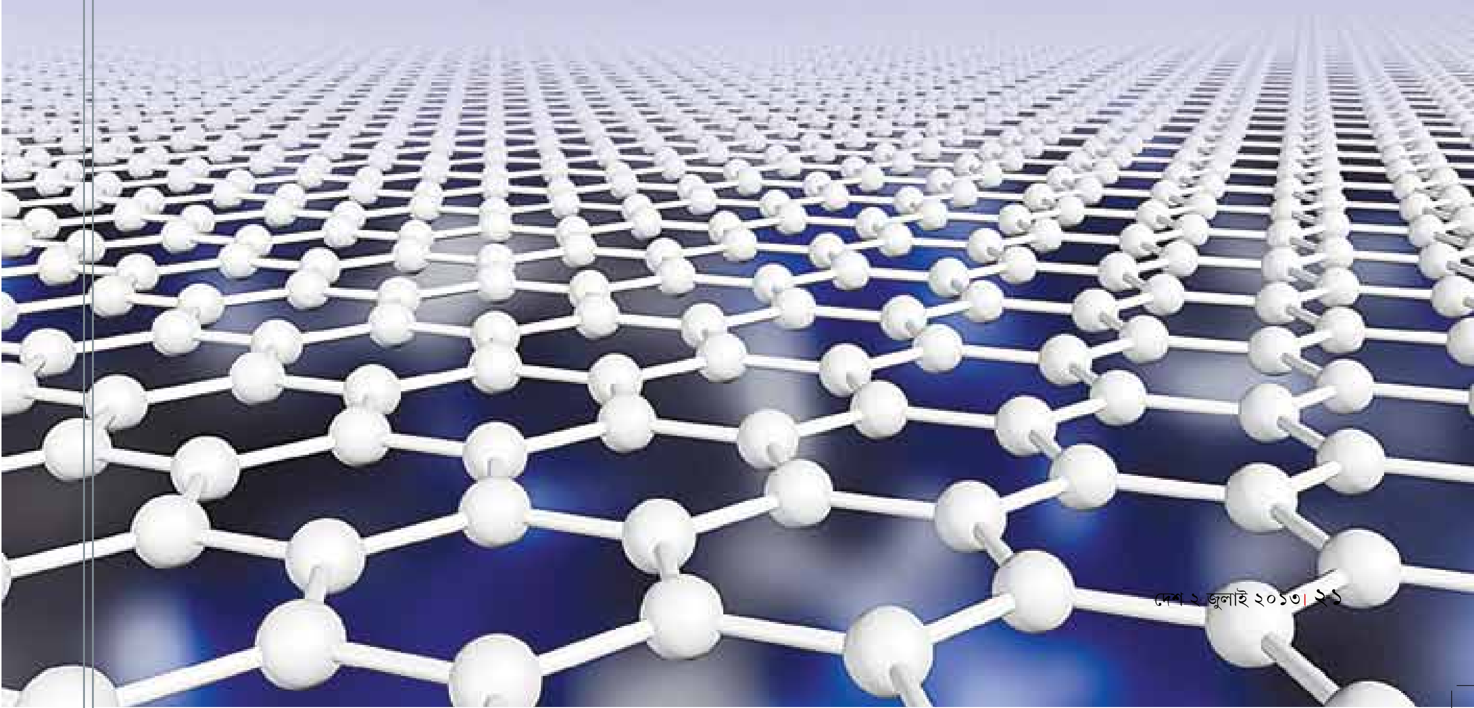

কার্বনের এক আশ্চর্য রূপ, গ্রাফিন-এর স্তর

> **১৯৮০র দশকে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক হ্যারল্ড ক্রোটো চেয়েছিলেন মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো কার্বনের মেঘ পৃথিবীতে তৈরি করে পরীক্ষা করতে।**

থেকে বেরনো আলোয় কী কী আলোকতরঙ্গ মিশে আছে তা বিশ্লেষণ করার পন্থা) সাহায্যে এই ধূলিকণার মূল রাসায়নিক উপাদানগুলোর খোঁজ করেন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা। জানা আছে এর বেশিটাই কার্বন। ১৯৮০র দশকে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক হ্যারল্ড ক্রোটো চেয়েছিলেন মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো কার্বনের মেঘের অনুরূপ পৃথিবীতে তৈরি করে স্পেকট্রোস্কোপির সাহায্যে তা পরীক্ষা করতে। এই গবেষণার জন্য অনুদান চেয়ে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞান সংস্থায় তিনি একটা প্রস্তাব জমা দিলেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। মহাজাগতিক গবেষণায় যে অসাধারণ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন তা প্রায় অনেকেরই থাকে না; বোধহয় সেই বিজ্ঞান সংস্থার আর্থিক অনুদান সমিতিরও কারও তা ছিল না।

কার্বনকে প্রচণ্ড উত্তাপে ধোঁয়া করে তাকে বিশ্লেষণের চিন্তা অবশ্য ক্রোটোকে ছাড়ল না। ভাবলেন, কিছু ছাত্র পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনুদান মিলতে পারে, তাতে এক্সপেরিমেন্টের ব্যয়ভার হয়তো বহন করা যাবে। কিন্তু কার্বনের ধোঁয়ার স্পেকট্রোস্কোপি করে তিন বছরে ডক্টরেট, পরে একটি চাকরি, এমন কোনও গ্যারান্টিও ক্রোটো কোনও ছাত্রকে দিতে পারলেন না। তাই ছাত্র এল না, টাকাও জুটল না, আর কাজও শুরু করতে পারলেন না।

হ্যারল্ড ক্রোটো

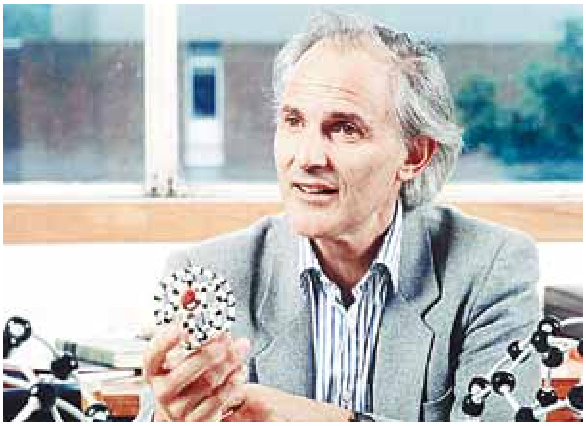

রবার্ট কার্ল

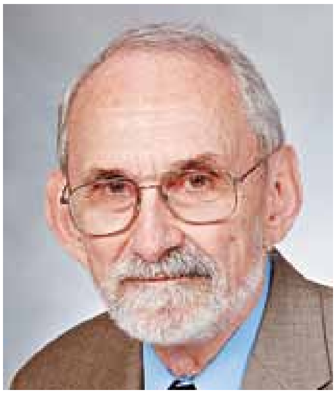

শেষে রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট কার্ল-এর মারফত কার্বনের ধোঁয়া তৈরি করার জন্য ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড স্ম্যালির সাহায্য চাইলেন তিনি। স্ম্যালি তাঁর নিজের গবেষণাগারে লেজার দিয়ে সিলিকন সেমিকন্ডাকটরের রিসার্চে ব্যস্ত ছিলেন। কার্বনের ধোঁয়াতে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না, তবে যেহেতু বন্ধুস্থানীয় কার্ল অনুরোধ জানিয়েছেন তাই দশ মাস পরে এক সপ্তাহের জন্য যন্ত্রটি ক্রোটো-কে ব্যবহারের অনুমতি দিলেন।

দশ মাস অপেক্ষার শেষে চাকুরে স্ত্রীর কাছে টাকা ধার করে ক্রোটো পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। পরীক্ষায় নামলেন। লেজার আলোর সাহায্যে তৈরি করলেন কার্বনের বাষ্প, কিন্তু আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণার ওপর করা বর্ণালিবীক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে এর বর্ণালি মেলাতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণার তুলনায় তিনি এখানে পেয়েছেন মাত্র গুটিকয় লাইন। মূল পদার্থটা অতিশয় সিমেট্রি-যুক্ত কোনও কার্বন অণু হলে সেটা সম্ভব (সিমেট্রি বা প্রতিসাম্য হল কোনও বস্তুকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখলেও অভিন্ন দেখানোর একটা পরিমাপ)। কিন্তু কী সেটা? কেমন তার গড়ন?

এবার মাঠে নামলেন স্ম্যালি। তাঁর অনুসন্ধান ইঙ্গিত দিল এই কার্বন বাষ্পের মধ্যে দু'ধরনের অণু প্রধানত রয়েছে। যে ধরনটা অনুপাতে অনেক বেশি রয়েছে তা ৬০টা কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি। অপরটায় রয়েছে ৭০টা কার্বন পরমাণু। সুতরাং সমস্যাটা দাঁড়াল এতগুলো পরমাণু কী বিন্যাসে পরস্পর যুক্ত হয়ে অত্যন্ত প্রতিসম এক রূপ নিয়েছে তা বার করা। সেটা নিয়েই ভাবতে ভাবতে এক সন্ধ্যায় তিন বিজ্ঞানী, ক্রোটো, স্ম্যালি এবং কার্ল, আবার পরের দিন আলোচনায় বসা যাবে ঠিক করে নিজ নিজ বাসভবনের দিকে এগোলেন।

বাড়ি ফিরেই স্ম্যালি ধরলেন তাঁর এক পরিচিত গণিতজ্ঞকে, তাঁদের পাওয়া ৬০ ও ৭০টি কার্বন এর অণু কী ধরনের জ্যামিতিক আকার নিতে পারে তা নিয়ে তাকে একটু ভাবতে বললেন। কার্ল অরিগামি করতেন। মনট্রিল শহরে ১৯৬৭ সালে যে প্রথম ট্রেড ফেয়ার হয়েছিল, সেখানে একটা বিশাল গম্বুজাকার প্যাভিলিয়ন তৈরি হয়েছিল। কার্ল তার গঠনে ৬০টা কার্বন অণুর সংযুতির প্রতিফলন পেয়ে কাগজ দিয়ে সেই ডোমের একটা মডেল বানিয়ে ফেললেন। আর ক্রোটো কিনতে গেলেন ফুটবল। ফুটবলে সাদায়-কালোয় ভাগ করা অনেকগুলো বহুভুজের ছবি তাঁর মনে ভাসছিল। কিন্তু আমেরিকানরা তো সাধারণত সকার ফুটবল খেলে না, তাই দোকানে পাওয়া গেল কেবল রাগবি বল।

ঘড়িতে তখন রাত্রি ৭টা, মানে ইংল্যান্ডের বাড়িতে রাত্রি ১টা। কিন্তু কিছু করার নেই, স্ত্রীকে ফোন করে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন, কোনও প্রশ্ন নয়, যা বলছি তা করে এখনই আমায় জানাও। তাঁকে বললেন, সেলারে গিয়ে তাঁদের ফুটবলটি খুঁজে বার করতে, এবং গুনে দেখতে তাতে কতগুলো ষড়ভুজ আর পঞ্চভুজ আছে। এই বলে তিনি ফোন ধরে রইলেন। স্ত্রী খেয়ালি স্বামীকে ভালই চিনতেন। ফুটবল নাড়াচাড়া করে তিনি জানালেন, সেখানে আছে ২০টি ষড়ভুজ, ১২টি পঞ্চভুজ। আর কৌণিক বিন্দুগুলো, যে কোণে এসে মিশেছে তিনটি করে বহুভুজ, তার মোট সংখ্যা? স্ত্রী জানালেন, ৬০।

পরের দিন সকালে স্ম্যালির কাছে এল তাঁর বন্ধু গণিতের অধ্যাপকের ফোন। তিনি জানালেন গণিতজ্ঞ অয়লারের ফরমুলার কথা। সেই অনুযায়ী ৬০ ও ৭০ কার্বনের অণুগুলোতে থাকতেই হবে ১২টা করে পঞ্চভুজ। পাল্টাবে শুধু ষড়ভুজের সংখ্যা। ২০টা ষড়ভুজ থাকলে অণুটার চেহারা হবে সকার ফুটবলের মতো আর ২৫টা ষড়ভুজ থাকলে সেটা দাঁড়াবে রাগবি বলের মতো। সেদিন যখন তিনজন আবার মিলিত হলেন, বোঝা গেল তিনজনই পৃথক ভাবে একই উত্তর পেয়েছেন: ফুটবল। স্বাভাবিকভাবেই ক্রোটো বললেন, অণুটার নাম দেওয়া হোক ফুটবলিন। কিন্তু দুই আমেরিকান বিজ্ঞানীর মন জুড়ে ছিল ট্রেড ফেয়ারের জিওডেসিক ডোম। সেটা বানিয়েছিলেন বিখ্যাত স্থাপত্যবিজ্ঞানী বাকমিন্স্টারফুলার। তাই তাঁর স্থাপত্যশৈলী নকল করা নতুন এই অণুর নামের সঙ্গে তাঁকে জোড়া হল। ৬০টা কার্বনের অণুর নাম দেওয়া হল বাকমিন্স্টারফুলারিন। নামটা বড়, তাই সহজেই তা ভেঙে বেরিয়ে এল ডাক-নাম: 'বাকিবল' (Buckyball)।

অয়লারের জ্যামিতির সাহায্যে ষড়ভুজের সংখ্যা বাড়িয়ে চললে এ ধরনের আরও বড় বড় অণু পাওয়া যেতে পারে। ৬০ থেকে বেড়ে ৭২টা কার্বন পরমাণুর, বা ৭০ থেকে বেড়ে ৮৪ কার্বন পরমাণুর অণু, অথবা আরও নানা কিছু। একত্রে

ভাবলে এগুলো সব হিরে-গ্রাফাইটের বাইরে এক নতুন গোত্রের কার্বন, যাদের একলপ্তে ডাকা চলে 'ফুলারিনস'। এখানে জানিয়ে রাখি, অধ্যাপক বাকমিনস্টারফুলার ১৯৬০-এর দশকে শিবপুর বি ই কলেজে (অধুনা বেসু) ভিজিটিং অধ্যাপক রূপে ছাত্রদের পড়িয়ে গিয়েছিলেন।

এই ফুলারিনগুলোকে বেঞ্জিন জাতীয় তরলে গুললে ভারী সুন্দর রঙিন দ্রবণ পাওয়া যায়। কঠিন অবস্থায় এগুলো দেখতে কিন্তু একেবারে কালো কয়লার গুঁড়োর মতো। ফুলারিনস আবিষ্কারের জন্য ক্রোটো, স্ম্যালি, ও কার্ল প্রায় ১০ বছর পরে, ১৯৯৬তে নোবেল পুরস্কার পান। তার আগে পাননি, কারণ লেজারের সাহায্যে কার্বন বাষ্প তৈরি করে খুব বেশি ফুলারিন পাওয়া যেত না। সহজ উপায়ে ফুলারিন তৈরি না করা অবধি তাঁদের আবিষ্কার খতিয়ে দেখে স্বীকৃতি দেওয়া যাচ্ছিল না। শেষমেষ সহজে ফুলারিন তৈরির পদ্ধতি বার করলেন বিজ্ঞানী ভল্ফ্গাং ক্রাসমের (Wolfgang Krätschmer) আর ডোনাল্ড হুফমান (Donald Huffman)। ফলে ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ প্রশস্ত হল।

এই পদ্ধতিতে হিলিয়াম গ্যাস ভরা পাত্রে (হিলিয়াম নিষ্ক্রিয় গ্যাস, তাই অবাঞ্ছিত কোনও বিক্রিয়া এড়ানোর জন্য এখানে এই গ্যাসের ব্যবহার) গ্রাফাইট দিয়ে তৈরি তড়িৎদ্বারের মধ্য দিয়ে উচ্চমাত্রার তড়িৎ পাঠিয়ে তাপমাত্রা তুলে দেওয়া হল প্রায় ৪৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পরিণামে ওই গ্রাফাইট কার্বনের ধোঁয়ায় পরিণত হয়ে ভুষোকালির মতো একটা গুঁড়ো পদার্থ তৈরি করল। সেই গুঁড়ো পদার্থটাকে গুলে নেওয়া হল বেঞ্জিন জাতীয় তরলে। পাওয়া গেল রঙিন দ্রবণ। মিশে থাকা পদার্থগুলোকে আলাদা করার পর হাতে এল প্রায় ৮৯ শতাংশ কার্বন-৬০ আর ১০ শতাংশ কার্বন-৭০। মোট প্রায় কয়েক মিলিগ্রাম, মোটামুটি ধরাছোঁয়ার যোগ্য একটা পরিমাণ।

আই আই টি-কানপুরে তৈরি কার্বন ন্যানোওনিয়ন

তবুও, এক গ্রাম গ্রাফাইটের ধোঁয়া থেকে মাত্র ৮৯ মিলিগ্রাম কার্বন-৬০ আর ১০ মিলিগ্রাম কার্বন-৭০ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রশ্ন হল, ধোঁয়ার বাকি প্রায় নব্বই শতাংশ, যা আদপেই বেঞ্জিনে গোলেনি তার চরিত্র কী? অধ্যাপক সুমিও ইজিমা (Sumio Iijima)১৯৮০ থেকেই কার্বন স্তরের উপর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে নানা পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। তিনি পড়লেন ওই বেঞ্জিনে অদ্রাব্য অংশটা নিয়ে। এবং আশ্চর্য! বেরিয়ে এল কার্বনের সম্পূর্ণ নতুন আর-একটা রূপ (একেবার নতুন নয়, তা পরে জানব)। সেখানে পরমাণুগুলোর বিন্যাস অনেকটা ফাঁক ফাঁক করে বোনা সরু তারের জালের মতো, যেরকম জালকে আমরা বলি 'চিকেন মেশ' তারজালি। জালের ফাঁকগুলো ষড়ভুজ আকৃতির, প্রতিটা শীর্ষকোণে বসে আছে একটা করে কার্বন পরমাণু।

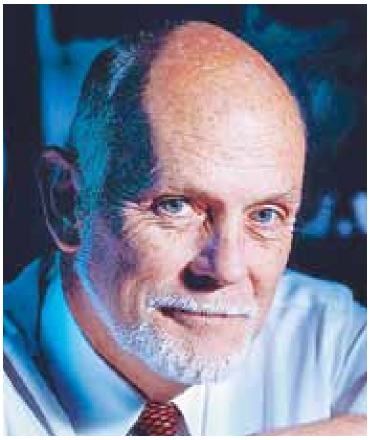

রিচার্ড স্ম্যালি

এই জালটা, ইজিমা দেখলেন, সমতল নয়, তা গুটিয়ে একটা চোঙের আকৃতি নিয়েছে— একটা কাগজকে লম্বা করে পাকালে যে-চেহারা নেবে, সেরকম। একটা কাগজ পাকালে একটা সাধারণ চোঙ হবে, কিন্তু এক-থাক কাগজকে পাকালে, একাধিক পরতের একটা চোঙ পাওয়া যাবে। কার্বন-জালের চাদর গুটিয়ে তৈরি এরকম চোঙের বাইরের ব্যাস প্রায় ২ থেকে ৫০ ন্যানোমিটার (এক ন্যানোমিটার = এক মিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ), ভেতরের ব্যাস এর থেকে সামান্য কম। ইজিমা এর নামকরণ করলেন 'মাল্টিওয়াল কার্বন ন্যানোটিউব'। 'বল'-এর বদলে এবার শুরু হল চোঙের জমানা। বিভিন্ন আকৃতির চোঙ। কোনওটা এক-পরত (সিঙ্গল ওয়াল), কোনওটা দুই পরত (ডাবল ওয়াল), কোনওটার মুখ বন্ধ, কোনওটার মুখ ইংরাজি Y অক্ষরের মতো দ্বিধাবিভক্ত, লম্বায় এবং প্রসারে নানা মাপের কার্বন ন্যানোটিউব গবেষণার পর গবেষণায় বেরতে থাকল। দিনে দিনে অবাক করতে থাকল ওই কার্বনের 'তারজালি'র পাকিয়ে যাওয়া, গুটিয়ে যাওয়ার প্রতিভা। সেটা কখনও সোজাসুজি চোঙের মতো, কখনও 'আইসক্রিম কোন'-এর মতো, ইত্যাদি নানারকম।

এদের গড়নের এই বিভিন্নতার জন্য তাদের তড়িৎধর্মেও দেখা দিতে থাকল অভিনবত্ব। কোনও কার্বন ন্যানোটিউব ধাতুর মতো ভাল তড়িৎ পরিবহন করতে পারে, অর্থাৎ সুপরিবাহী। কোনওটা কুপরিবাহী। কোনওটা আবার অর্ধপরিবাহী, যেমন সিলিকন নির্মিত সেমিকন্ডাক্টর। এই একটা কারণেই এখনই ইঙ্গিত

ওরিয়ন নেবুলা থেকে ভেসে আসছে বিভিন্ন মহাজাগতিক কার্বন অণুর সংকেত

নাসা

পাওয়া যাচ্ছে যে, ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তিতে কার্বন ন্যানোটিউবের ব্যবহার একদিন সিলিকনকে পেছনে ফেলে দেবে।

চুলের থেকেও লক্ষ গুণ সরু এই ন্যানোটিউব স্টিলের তারের থেকে শক্ত। এটা দিয়ে তাই তৈরি হচ্ছে বুলেট প্রুফ জামা, যা হালকা। একটা এক-পরত কার্বন ন্যানোটিউবকে যদি মনে করি ফাঁপা আটার লেচি, আর সেটাকে ছোট ছোট অংশে ছিঁড়ে নিয়ে রুটি বেলার আগে হাতে তুলে আটার গোলা বানানোর মতো করে পাকাই, তবে আমরা পাব বাকিবল। তার অনুষঙ্গে কার্বন ন্যানোটিউবের নাম তাই দাঁড়াল ‘বাকিটিউব’। যদি অনেকগুলো পরত যুক্ত কার্বন ন্যানোটিউবের লেচি নিয়ে গোলা পাকানো হয়? তবে পাব একটা পেঁয়াজের মতো অনেক স্তর যুক্ত গোলক: কার্বন ন্যানো-ওনিয়ন। এমন পেঁয়াজ-অণুর অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণ করেছিলেন ইজিমা।

সুমিও ইজিমা

হান্‌স্‌-পিটার বোএম

গ্রাফাইট তো আজকের জিনিস না। তার গঠনটা আমাদের জানা আছে অনেকদিন হল। গ্রাফাইটেও কার্বন পরমাণুগুলো একটা চাদরের মতো, বা বলা ভাল, পাতলা জালের মতো বিন্যাসে সাজানো থাকে, ঠিক যেরকম ষড়ভুজাকার ফাঁক-যুক্ত জালের কথা আমরা ওপরে জেনেছি। একখণ্ড গ্রাফাইটে ওপর থেকে নীচে পরপর থাকে এরকম অজস্র জালের স্তর। একটা স্তরকে তুলে নিয়ে পাকিয়ে দিলেই আমরা পেয়ে যাব ন্যানোটিউব।

গ্রাফাইটে প্রতিটা স্তরে কার্বন পরমাণুগুলো নিজেদের বেশ কড়াভাবে ধরে থাকলেও ওপর-নীচে স্তরগুলোর মধ্যে বিশেষ জোরালো বন্ধন থাকে না। যে ধরনের আলগা বল এখানে কাজ করে, তাকে এই ধরনের বলের প্রথম প্রস্তাবকের নাম অনুসারে, ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্স বলা হয়। এই বল খুবই দুর্বল, কিন্তু কোটি কোটি পরমাণু জড়িত থাকার কারণে এই দুর্বল আকর্ষণও সম্মিলিত ভাবে গ্রাফাইটের সব স্তরকে বেশ ভালভাবে ধরে রাখে। আগেই বলেছি, গ্রাফাইটের একটা স্তর পাকিয়ে এক-পরত ন্যানোটিউব পাওয়া যাবে। কিন্তু একটুও না পাকিয়ে কোনওভাবে কি কার্বনের একটা স্তর গ্রাফাইট থেকে বার করা সম্ভব? ঘটনা হল, এরকম জিনিস অনেক আগেই তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা শক্ত ছিল। প্রায় ১৯০৬ থেকে গ্রাফাইটকে রাসায়নিকে গুলে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল বেশ কয়েকবার, কিন্তু উপযুক্ত টেকনোলজির অভাবে সেই গবেষণাগুলোর পরিণতি সম্যক বোঝা যায়নি। ২০০৪-এ ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি যন্ত্রের সাহায্যে ডক্টর হাইম ও ডক্টর নোভোসেলভ দেখালেন, কার্বনের একটা স্তর গ্রাফাইট থেকে তুলে আনা সম্ভব। একটা স্বচ্ছ টেপ এক টুকরো গ্রাফাইটে চেপে লাগিয়ে বেশ জোরে টানলে একটা স্তর বেরিয়ে আসে। এই আবিষ্কারের জন্য ২০১০-এ এঁরা দু’জন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

গ্রাফাইটের এই এক-স্তর অবস্থার নাম গ্রাফিন। আনুষ্ঠানিক আবিষ্কারের পর সেটাকে কী ভাবে ঠিকঠাক উপায়ে তৈরি করা যায় তার খোঁজ চলল, আর তখন সেই বিস্মৃতিতে হারিয়ে যাওয়া গবেষণার রেসিপিগুলোকে ধুলোটুলো ঝেড়ে তুলে আনা হতে থাকল। গ্রাফাইটের একটা স্তরের নাম হিসেবে ‘গ্রাফিন’ শব্দটা কিন্তু ১৯৬২তে অধ্যাপক বোএম (Hans-Peter Boehm) প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তিনিই প্রথম রাসায়নিক পদ্ধতিতে এটা আলাদা করে এক্সরে-র মাধ্যমে এর সঠিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। এবং আজ তাঁর রেসিপিই সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই তাঁর নাম নোবেল প্রাইজে না থাকার ব্যাপারটা সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

কার্বন ন্যানোটিউব যেন একটা সরু দাগ— দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু প্রস্থ নামমাত্র। তাই কার্বন ন্যানোটিউবকে ধরা হয় একমাত্রিক। তবু তার বলার মতো দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু বাকিবল বা কার্বন ন্যানো-ওনিয়ন-এর তো তাও নেই! কাজেই এগুলো হল শূন্য-মাত্রিক। গ্রাফিনকে বলা চলে দ্বিমাত্রিক। এই দ্বিমাত্রিক গ্রাফিন আর এক-মাত্রিক ‘বাকিটিউব’ ইলেকট্রনিক্স শিল্পে সিলিকন টেকনোলজিকে পেছনে রেখে ন্যানো টেকনোলজি যুগের শুভারম্ভ করেছে। আর ওদিকে শূন্য-মাত্রিক ডট বা ওনিয়ন রূপগুলি নতুন দিশা দেখাচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গবেষণায়।

কিন্তু একটা বড় বাধা হল, কার্বন জলে গোলে না, সে যে রূপেই হোক না কেন। অথচ জীবনের ক্ষেত্রে জলই এক মাত্র বন্ধু-মাধ্যম। কাজেই চিকিৎসাজগতে কাজে লাগাতে গেলে এই কার্বনগুলিকে এমন রূপ দিতে হবে যাতে এরা জলে দ্রাব্য হয়ে ‘ওয়েট ন্যানোটেকনোলজি’তে কাজে লাগতে পারে। কার্বন ডট বা ওনিয়ন নিয়ে সেই লক্ষ্যে কিছু কাজ এগিয়েছে। সেজন্য জলে গুলতে পারে এমন কিছু বড় বড় জৈব

কার্বন-ভুবনের দুই বাসিন্দা, বাকিবল এবং কার্বন ন্যানোটিউব। লম্বা দাগগুলি আসলে অদৃশ্য বন্ধনী, দাগগুলি যেখানে মিলেছে সেখানে বসে আছে একটি করে কার্বন পরমাণু

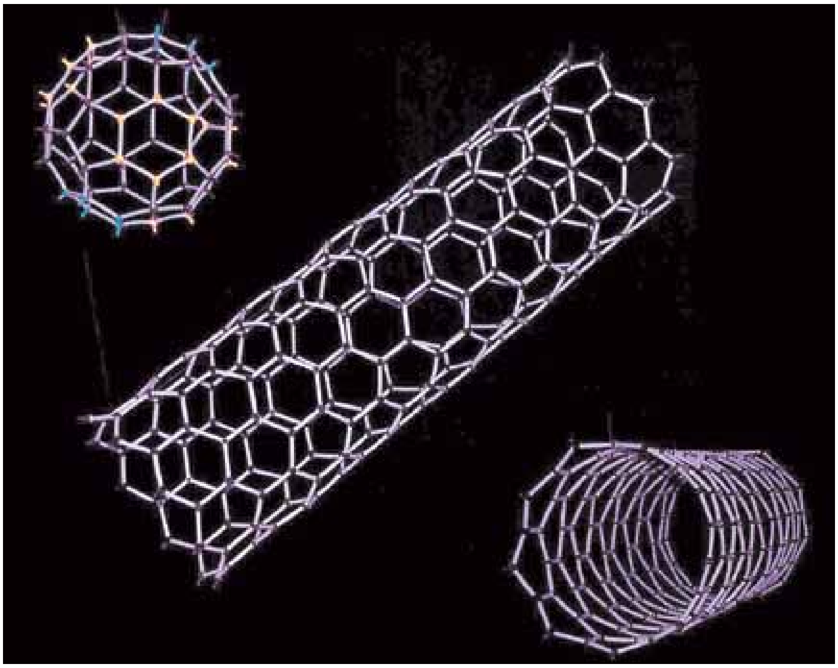

অণু দিয়ে এই কার্বন ডট বা ওনিয়নগুলিকে ভাল করে জড়িয়ে দেওয়া হয়, ফলে এগুলো একপ্রকারে জলে দ্রাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ব্যাপার। আবার এই জড়ানো ব্যাপারটা খুব একটা শক্তপোক্ত হয় না, তাই দ্রবীভূত অবস্থায় বিভিন্ন রাসায়নিক ও জৈবরাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বন ডটটির ছদ্মবেশ খুলে পড়ে।

অন্য পন্থা হল সরাসরি রাসায়নিক বন্ধনীর সাহায্য নেওয়া। কিন্তু নিটোল কার্বন ন্যানোওনিয়ন বা ডটে রাসায়নিক বন্ধনী কামড় বসাবে কোথায়? তাই প্রয়োজন ওপরের আস্তরণে কিছু বিকৃতি সৃষ্টি করা। সেটা করা যেতে পারে নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি জারক দিয়ে। ন্যানোকার্বন বা ডটের কিছু কিছু জায়গা এর ফলে জারিত হয়ে কারবক্সিলেট গ্রুপ তৈরি করে, অর্থাৎ নিছক কার্বন আর থাকে না, তার সঙ্গে যুক্ত হয় দুটো অক্সিজেন পরমাণুও। জলে দ্রাব্য ফুলারিন তৈরিতে আই আই টি কানপুর অন্যতম পথিকৃৎ; ১৯৯২ সালেই সেখানে ফুলারিন রিয়্যাক্টর নির্মাণ করা হয়েছিল।

এমনিতেই নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে ন্যানো-ওনিয়ন ইত্যাদিকে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। পরিষ্কার করাটা জরুরি কারণ বহু অশুদ্ধি এতে মিশে থাকে, যা অ্যাসিডে দূর করা যায়। কিন্তু অ্যাসিডের মধ্যে একটু কম সময় রেখে দিলে ন্যানো-ওনিয়নগুলো সঠিক পরিষ্কার হয় না, ওদিকে বেশি সময় রাখলে বিকৃতি তৈরি হয়। অপরিষ্কার বা বিকৃতি-যুক্ত ন্যানো কার্বন ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহারের অযোগ্য। আবার ন্যানোকার্বন সাধারণভাবে তৈরি করলে বেশি বিকৃতি-যুক্ত হয়ে পড়ে।

এই ধরনের ন্যানোকার্বন আমরা অজানা কাল ধরে ব্যবহার করে আসছি, যেমন কাজল। আজ অনেকে কাজলকে চোখের পক্ষে খারাপ বলে থাকেন, কিন্তু তার কারণ ন্যানোকার্বন জনিত কোনও জৈব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া নয়। আসলে এগুলো অত্যন্ত শক্ত ও সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য চোখের কোষ-পর্দার ক্ষতি করতে পারে। অথচ তেল দিয়ে ভাল করে মাড়িয়ে নিয়ে মা-ঠাকুমা যখন চোখের পাতার ভেতর সাবধানে তাজা কাজল লাগিয়ে দিতেন তখন ন্যানোকার্বন তার বিশেষ কাজগুলি, যেমন ব্যাকটেরিয়াকে ধরে রেখে বাড়তে না দেওয়া ও অন্য কোনও অহিতকর জিনিস আটক করে চোখকে সুস্থ রাখা, ইত্যাদি ঠিকই পালন করত। শিশুদের পেট ফাঁপলে আমেরিকাতে ন্যানোকার্বন যুক্ত কলিক কাম ওয়াটার ব্যবহারের চল বেশি।

আই আই টি-কানপুরে ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে তোলা মাছির ছবি

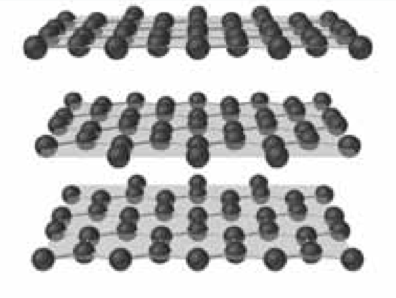

স্তরে স্তরে বিন্যস্ত গ্রাফাইট

মা-ঠাকুমা যখন চোখে কাজল লাগিয়ে দিতেন তখন ন্যানোকার্বন তার বিশেষ কাজগুলি, কোনও অহিতকর জিনিস আটক করে চোখকে সুস্থ রাখা, ইত্যাদি ঠিকই পালন করত।

আমাদের দেশে এবং অন্যত্রও মাঠে ফসল ওঠার পর খড় বা মাঠের আগাছাগুলোকে আগুন লাগিয়ে কালো করে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। সেগুলোকে একেবারে ছাই করে দেওয়া হয় না। এই কালো পদার্থের অনেকটাই হল ন্যানোকার্বন যা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ও জলকে ধরে রাখে এবং নতুন ফসলের চারাকে সেসব একটু-একটু করে জোগায়। এটা যেন অপচয় বাঁচিয়ে ছোট্ট বাচ্চাকে চামচ দিয়ে খাওয়ানো। এটা কম সারের সঠিক প্রয়োগ ও কম জলে চাষের সহায়ক। কাঠের গুঁড়ো পুড়িয়ে যে ন্যানোকার্বন, ধরা যাক ন্যানো-ওনিয়ন মেলে, অ্যাসিডের সাহায্যে তার ওপরের ছালটা জারিত করে কারবক্সিলেট গ্রুপে পরিণত করলে তা জলে দ্রাব্য হয়ে পড়ে। এবারে কিন্তু কয়লা সত্যিই জলে গুলে গেল। এই ওনিয়নগুলি তাদের মাপ অনুযায়ী নানা রঙের আলোর প্রতিপ্রভা ছড়ায় (অর্থাৎ এগুলি ফ্লুরোসেন্ট)। তাই চিকিৎসাক্ষেত্রে শরীরের অভ্যন্তরের ছবি তোলার জন্য এদের ব্যবহার হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা এগুলি ইঞ্জেকশনের সাহায্য না নিয়ে শুধু খাবারে মিশিয়েই ব্যবহার করা যেতে পারে। জীববিজ্ঞানের নানা শাখায় নমুনা-প্রাণী হিসেবে ফলের মাছি *ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাস্টার*-এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কী করে একটামাত্র কোষ থেকে একটা পূর্ণ প্রাণীদেহ গড়ে ওঠে তার চর্চা যে-শাস্ত্রে হয় সেই ডেভেলপমেন্ট বায়োলজির গবেষণায় সম্প্রতি এই মাছিটার গোটা জীবনচক্রকে ন্যানো-ওনিয়ন কাজে লাগিয়ে ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে রঙিন চিত্রে ধরা গেছে। এই ন্যানো-ওনিয়ন শরীরের কোনও ক্ষতি করে না, ভেতরে বেশিক্ষণ থাকেও না। শরীরের আবর্জনার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ভবিষ্যতে এই ন্যানো-ওনিয়নের জলীয় দ্রবণ পান করিয়ে খুব কম খরচে শরীরের ভেতরকার রঙিন ছবি পাওয়া যাবে, যা পাল্লা দিতে পারবে এক্স-রে ও এম আর আই ইমেজের সঙ্গে। ন্যানো-ওনিয়ন রোগের অবস্থা সম্পর্কে যেমন জানাতে পারবে তেমনই সঠিক জায়গায় প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার কাজও করবে। বর্তমানে শিবপুরে ‘বেসু’-তে ক্যানসার কোষের ছবি তোলা ও সঠিক লক্ষ্যে ওষুধ পৌঁছে দেবার কাজে ন্যানো-ওনিয়ন ব্যবহারের উপায় খোঁজা হচ্ছে।

অন্য আরও এক দিগন্তে এখন এইসব ন্যানোকার্বন সাড়া জাগাচ্ছে। এরা সূর্যের আলো শোষণ করতে পারে। কাজেই সৌরশক্তি সংক্রান্ত গবেষণাতেও ডাক পড়েছে এদের।

সম্মিলিত ভাবে কোনও একটা মৌলের কার্বনের মতো এত ব্যাপক অবদান বোধহয় আর নেই। জীবজগতে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলে এর বিপুল প্রকাশের কথা এখানে ধরিইনি আমরা, পৃথিবীতে জীবনের অভিযানটাই ঘটত না কার্বন বিনা। আমাদের আলোচনা সীমিত থেকেছে অজৈব রসায়নের ক্ষেত্রে। চিরপুরাতন আরও কতভাবে চিরনূতন হয়ে উঠবে তা কে জানে!

লেখক আই আই টি-কানপুর-এ রসায়নের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বর্তমানে ‘বেসু’-র এমেরিটাস অধ্যাপক ও রামান্না ফেলো।